বাংলাদেশ : রবীন্দ্রপত্রের প্রেক্ষাপটে

গৌরচন্দ্র সাহা

বাংলাদেশ তথা পূর্ববঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের শিকড়ের সন্ধান করতে গেলে আমাদের পৌঁছতে হবে অনেক দূরে—উত্তরপ্রদেশের কনৌজ বা কন্যাকুব্জ অঞ্চলে। কিংবদন্তি অনুসারে মহারাজ আদিশূরের সময়ে বাংলার ব্রাহ্মণকুলে এক অবক্ষয়জনিত মালিন্য বা গ্লানির পরিবেশ সৃষ্ট হয়। এই গ্লানি থেকে মহারাজা আদিশূর ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে এবং তার হৃত-গৌরবকে ফিরিয়ে দিতে নতুন রক্ত সঞ্চালনের উদ্দেশ্যে পাঁচ জন কুলীন ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করে এনে অধুনা বাংলাদেশের যশোহর খুলনা অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আধুনিক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা সেই কনৌজ-কৌলীন্যের উত্তরাধিকারী। পরবর্তীকালে ম্লেচ্ছদোষদুষ্ট হয়ে এঁদের বংশধরদের কেউ কেউ ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য হন। পরিণামে তাঁদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কসূত্রে জড়িত সকল ব্যক্তিই সমাজব্যবস্থার ধ্বজাধারী কূল-মেল-স্থিরীকরণের প্রবক্তা ঘটকদের হাতে প্রায় অচ্ছুত নিম্নস্তরের হিন্দু বলে পরিগণিত হলেন এবং পীর-আলির অনুবর্তী পীরালি ব্রাহ্মণরূপে প্রায় পতিত অসম্মানিত জীবন ধারণের ও জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হবেন। হিন্দু অভিজাত সমাজে এঁরা রইলেন অপাংক্তেয়। এঁদের পুত্র কন্যাদের বিবাহ ইত্যাদিও কঠিন হয়ে পড়ল। এমনই এক পীরালি পুরুষ ছিলেন শুকদেব। এঁর কন্যাকে বিবাহ করেন পিঠাভোগের জমিদার জগন্নাথ কুশারী। জগন্নাথ কুশারী বর্ণ হিন্দু হলেও পীরালি গোত্রে বিবাহহেতু সমাজে 'এক ঘরে' হন এবং এঁরই এক অধঃস্তন বংশধর ভাগ্যান্বেষণ এবং অপেক্ষাকৃত সম্মানজনক জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে ইংরেজশাসিত কলকাতায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। কলকাতা তখন পাড়া-গ্রাম নয়। সমাজপতিদের প্রতাপও ইংরেজ-আইনে কিছুটা ম্লান। সেখানকার সামাজিক আবহাওয়াও দমবন্ধ করার মতো নয়। যেহেতু আদিতে ব্রাহ্মণ এবং উপবীতধারী—ব্রাহ্মণ আশপাশের তথাকথিত অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেরা এঁদেরা 'ঠাকুর' সম্বোধন আখ্যায়িত করতেন। ক্রমে এঁদের পুরানো 'কুশারী' পদবীটাই মুছে গেল, যুক্ত হল 'ঠাকুর' উপাধি। দ্বারকানাথ ঠাকুর—প্রিন্স দ্বারকানাথ এই ঠাকুর বংশেরই সন্তান এবং যৌবনে তিনি ধনে মানে কলকাতার অভিজাত সমাজে অগ্রগণ্য ইংরেজ প্রজা। দ্বারকানাথের পালক পিতা রামলোচন ঠাকুরও বৈষয়িক বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন। বাংলাদেশে শিলাইদহ সন্নিহিত বিরাহিমপুরের জমিদারি তিনিই ক্রয় করেন। দ্বারকানাথও সেই ধারা বজায় রেখে সাজাদপুর কালীগ্রাম পতিসরে বিস্তীর্ণ জমিদারির অধিকারী হন এবং দ্বারকানাথ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যৌবনে ধর্ম এষণায় আপ্লুত হলেও জমিদারিগুলি নষ্ট হতে দেন নি। সত্য কথা এই যে ঘোর আর্থিক দুর্দিনে বাংলাদেশের জমিদারিগুলির প্রাপ্ত খাজনা থেকেই এই বৃহৎ পরিবারের অন্নবস্ত্রের সংস্থান হত। প্রজাদের প্রতি একটা মমত্ব দেবেন্দ্রনাথের ছিল এবং সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও তা সংক্রমিত হয়েছিল। দৈব দুর্যোগে জমিদারির শস্যহানি ঘটলে এবং প্রজারা খাজনা দিতে না পারলে দেবেন্দ্রনাথ অন্যত্র থেকে অর্থের সংস্থান করেও প্রজাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন বহুবার। রবীন্দ্রনাথও বিলক্ষণ জানতেন

প্রজাদের অন্নে তাঁদের পুষ্টি। তাই পরবর্তীকালে প্রজাদের সুখে রাখবার জন্য চাষবাসের আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা শিখে আসবার জন্য পুত্র ও জামাতাকে আমেরিকা পাঠিয়েচিলেন, তাঁদের বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রজাদের অর্থেই তাঁদের বিদেশে শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হয়েছে। সুতরাং, কৃতকার্য হয়ে দেশে ফিরে প্রজামঙ্গলে আত্মনিবেশ করা তাদের প্রথম কর্তব্য। তারপরের ইতিহাস তো পাঠকের জানা।

২

রবীন্দ্রনাথ প্রথম বাংলাদেশের স্পর্শ পেলেন ১৮৭৫ সালের শেষভাগে। এ বছর ৫ ডিসেম্বর কিশোর রবীন্দ্রনাথ জলপথে পিতা দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এলেন শিলাইদহে। সম্ভবত বোটেই চিলেন। বোটে রক্ষিত একখানি গীতগোবিন্দ পেয়ে কবি তাতেই বুঁদ হয়ে রইলেন। সংস্কৃত ভাষার উপমা উৎপ্রেক্ষা অনুপ্রাসের চমকে ঝলকে। এই যাত্রাতেই কবি এলেন রামপুর বোয়ালিয়ায় ব্রাহ্মভক্তদের মধ্যে। একটি ব্রহ্মসংগীতও গেয়েছিলেন বালক কবি। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সংবাদসূত্রে এটুকুই জানা যাচ্ছে। এই ভ্রমণকালেই কবি কলকাতা থেকে চারখানি চিঠি পেয়েছেন। সদর দপ্তরের খরচ-খাতায় ডাক মাসুলের উল্লেখ আছে। অনুমান করতে দ্বিধা নেই এই চিঠিগুলি কাদম্বরী দেবীর লেখা, কিন্তু একখানি চিঠিও রক্ষা পায় নি কালের কবল থেকে।

কবি পরের বার শিলাইদহে এলেন ১৮৭৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি, সঙ্গে অভিভাবক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ-যাত্রায় শিলাইদহের নৈসর্গিক সৌন্দর্য বেশ ভালোভাবে উপভোগের সুযোগ পেয়েছিলেন কবি। অবাধ স্বাধীনতা মিলে ছিল দাদার কাছ থেকে। তাই মাঠে ঘোড়া ছোটানো থেকে হাত কাটা বিশ্বনাথ শিকারির সঙ্গে বাঘ শিকারে অংশ নেওয়া বা ফুলের রস দিয়ে তৈরি কালিতে কবিতা লেখার উদ্ভট প্রয়াসেও বাধা আসেনি কবির। শিলাইদহে থেকে কলকাতায় ফিরে এসে কবি বেশ কটি চিঠিও দাদাকে লিখেছিলেন। সেগুলিও পাওয়া যায় নি। পেলে হয়তো জানা যেত কবির মানসলোকে শিলাইদহে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল।

৩

এর পর সুদীর্ঘ বিরতি। ১৮৮৩ সালের শেষভাগ পর্যন্ত কবির মনে শিলাইদহে নিয়ে তাপ উত্তাপের প্রত্যক্ষ প্রমাণ তেমন ভাবে আমাদের হাতে নেই। এর মধ্যে বিলেতে গেছেন, ফিরেও এসেছেন। লেখাপড়ায়, অভিনয়ে, কবিতা-রচনায় মন দিয়েছেন, কিন্তু শিলাইদহ নিয়ে 'প্রায়-নিশ্চুপ'।

১৮৮৩ সালের সেপ্টেম্বর পিতা দেবেন্দ্রনাথ মুসৌরি থেকে পুত্র রবীন্দ্রনাথকে ডেকে পাঠালেন। কারণ খুব স্পষ্ট নয়। তবে মনে হয় সদ্য-যুবক পুত্রকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য পিতা তখন ব্যগ্র-সেই নিয়েই আলোচনা। বিবাহ-উত্তর জীবনে কবি কী করতে চান বা কোথায় স্থিত হতে চান এ নিয়েও নিশ্চয় আলোচনা হয়েছিল কারণ কবির বিবাহের দুদিন পূর্বে ৭ ডিসেম্বর বক্সার থেকে লেখা একপত্রে মহর্ষি পুত্রকে লিখছেন : 'এই ক্ষণে তুমি জমিদারির কার্য্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিতরূপে বসিয়া সদর আমীদের নিকট হইতে জমা ওয়াশীল বাকী ও জমা খরচ দেখিতে থাক।...না জানিয়া শুনিয়া এবং কার্য্যের গতি বিশেষ

[illegible] প্রভৃতি বিষয়ে কবি [illegible] হয়ে উঠলেন। ক্রমে মহর্ষি তাঁকে শিলাইদহের পর্যবেক্ষক এবং আরও পরে পূর্ববাংলার সবকটি জমিদারির সর্বময় কর্তৃত্ব অর্পণ করলেন। কবিও কখনো পিতার প্রত্যাশার অমর্যাদা করেননি। শিলাইদহের দায়ভার পেয়েই কবি সেখানে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে রীতিমতো সংসার স্থাপনা করলেন। কবি এখন থেকেই মুখ্যত জলপথে পরিক্রমায় বের হতেন সাজাদপুর কালীগ্রাম পতিসরের জমিদারিগুলি পর্যবেক্ষণ করতে। এই ভ্রমণগুলি কবির কাছে ছিল আনন্দে পরিপূর্ণ। শিলাইদহকে কবি ভালোবেসেছিলেন তার নির্জন বালুবেলার জন্য, তার মোহময়ী সকাল সন্ধ্যাগুলির জন্য, চক্রবাকের কলরব মুখরিত চরভূমির জন্য। সাজাদপুর পতিসর তাঁকে টেনে আনত সহজ সরল প্রজাদের দেখা পাবার জন্য, তাদের আনন্দ দুঃখ ভাবনা বেদনার শরিক হবার জন্য। সব মিলে পদ্মা যমুনা গোরাই, নাগর নদী-বিধৃত অন্তহীন চলনবিলের জলরাশির জন্য কবি যেন আত্মীয়সুলভ উৎকণ্ঠায় উদ্বিগ্ন থাকতেন। বাংলাদেশের নৈসর্গিক প্রকৃতি। তার সজীব প্রকাশ—যেন তারও প্রাণ আছে মন আছে, রোষ আছে, আছে ভালোলাগা, ভালোবাসা—এ সবের সঙ্গে জড়িত হয়ে কবিও যেন কেমন করে মিলেমিশে একাত্ম হয়ে যান তা তিনি ভেবে পান না। পূর্ব-বাংলার সেই 'নদী-জপ-মালা ধৃত' প্রান্তর কেমন করে যেন কবির বন্ধু, কবির প্রেয়সী হয়ে গিয়ে তার আন্তরসংগীত মর্মে মর্মে অঙ্গীকার করে নেন তার আদি অন্ত আমাদের কল্পনাতে সবটা ধরা পড়ে না। এই প্রণয়িনী-স্বরূপা পূর্ববঙ্গকে কবি কখনও কখনও মাতৃজঠর হিসেবেও কল্পনা করে সুখ পেয়েছেন। অনেকবার পূর্ববঙ্গে এসে তাঁর মনে হয়েছে এ-যেন মাতৃক্রোড়, এখানে এলে তাঁকে যেন আলাদা করে আরোগ্য বা পুষ্টির কথা ভাবতে হয়